ফিক্বহ

বাংলার মিশন-কোর্স

(পঞ্চম শ্রেণী)

পুনর্বিন্যাস

আব্দুল হামীদ মাদানী

জ্ঞানের মর্যাদা

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} (١١) المجادلة

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। *(মুজাদিলাহ ঃ ১১)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا} (١١٤) سورة طه

অর্থাৎ, বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।' *(ত্বা-হা ঃ ১১৪)*

আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِى جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি এমন পথে চলে যাতে সে ইল্ম অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাত যাওয়ার পথ সহজ করে দেন। নিঃসন্দেহে ফিরিশ্তাবর্গ ইল্ম অনুসন্ধানীর ঐ কর্মে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তার জন্য তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেন। অবশ্যই আলেমের জন্য আকাশবাসী সকলে এবং পৃথিবীর অধিবাসী---এমন কি পানির মাছ পর্যন্তও ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে থাকে। আবেদ (ইবাদতকারী) অপেক্ষা আলেমের উচ্চ মর্যাদা ঠিক তদ্রূপ যদ্রূপ সমগ্র তারকারাজি অপেক্ষা চন্দ্রের। নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের ওয়ারেসীন (উত্তরাধিকারী)। নবীগণ না কোন দীনারের উত্তরাধিকার করেছেন, না কোন দিরহামের। বরং তাঁরা ইলমেরই উত্তরাধিকার করে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে সে পর্যাপ্ত অংশ গ্রহণ করে থাকে।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাক্বী, সহীহ তারগীব ৬৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسلِم.

অর্থাৎ, "প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইল্‌ম (দ্বীনী জ্ঞান) অনুসন্ধান করা ফরয।" *(ইবনে মাজাহ)*

ফিক্বহ-পরিচিতি

আভিধানিক অর্থ ঃ গভীর জ্ঞান

পারিভাষিক অর্থ ঃ বিস্তারিত দলীল-সহ শরীয়তের ব্যবহারিক বিধি-বিধানের জ্ঞানকে 'ফিক্বহ' বলা হয়।

সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত ইবাদতের বিধি-বিধান এবং ব্যক্তি ও সমাজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবহারিক বিধি-বিধান উভয়ই ফিক্বহের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং ফিক্বহের মধ্যে যেমন আধ্যাত্মিক বিধান রয়েছে, তেমনি দেওয়ানী আইনও বিবৃত হয়েছে। কেননা ইসলামী শরীয়তের আবির্ভাব ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়ের ব্যবস্থাপক হিসেবে হয়েছে। তবে ফিক্বহ ও শরীয়তের মধ্যে পার্থক্য করা অপরিহার্য। যেহেতু শরীয়ত হল দুই অহী (কুরআন ও সুন্নাহ)র পবিত্র ও সুরক্ষিত স্পষ্ট বাক্যাবলী। পক্ষান্তরে ফিক্বহ হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর বাক্যাবলীর সমন্বয়ে উপলব্ধ মুজতাহিদ ফক্বীহগণের জ্ঞান। সুতরাং এক মুজতাহিদ (গবেষক)-এর বুঝ অন্য মুজতাহিদ অপেক্ষা ভিন্নতর হয়ে থাকে। আর তার ফলে ফিক্বহবিশারদগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এ মতভেদ দ্বীনের 'ফুরূয়ী মাসায়েল' (গৌণ সমস্যাবলী)তে হয়ে থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, দ্বীনের আক্বীদাগত সকল ব্যাপারকে 'উসূলী' (মৌল) এবং আহকাম বা কর্মগত সকল ব্যাপারকে 'ফুরূয়ী' মাসায়েল বলা হয়। যদিও দ্বীনের কোন অংশই গৌণ ব্যাপার নয়।

তাশরী' বা বিধান-প্রবর্তনের উৎসসমূহ

১। কুরআন মাজীদ

২। নবী ﷺ-এর সুন্নাহ (সহীহ হাদীস)।

৩। ইজমা' (মুসলিম উলামার সর্ববাদিসম্মতি বা ঐক্যমত)।

৪। ক্বিয়াস (অনুমিতি, এক দলীলভিত্তিক বিষয়ের বিধান অনুরূপ অন্য এক দলীলহীন বিষয়ে প্রয়োগ)।

ইজতিহাদ (স্বাধীন গবেষণা)র সূত্রপাত

কখনো কখনো এমন সমস্যা দেখা দেয়, যার সমাধানের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের উক্তি নীরব থাকে অথবা একাধিক অর্থবহ থাকে এবং সে ব্যাপারে কোন 'ইজমা'ও পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে সমাধান পাওয়ার লক্ষ্যে ইজতিহাদ আবশ্যক হয়। এই শ্রেণীর সমস্যা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর জীবদ্দশাতেও সাহাবাগণের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁরা নিজ নিজ স্বাধীন ইজতিহাদে সমাধানও ব্যক্ত করেছেন এবং তিনি তার অনুমোদনও দিয়েছেন।

খন্দকের যুদ্ধ শেষে আল্লাহর রসূল ﷺ যখন ঘরে ফিরে এলেন এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম রাখলেন, তখন জিবরীল ﷺ এসে তাঁকে বললেন, 'আমরা এখনো অস্ত্র রাখিনি। অতএব আপনি (চুক্তি ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক ইয়াহুদী সম্প্রদায়) বনী কুরাইযার উদ্দেশ্যে বের হন। সুতরাং আল্লাহর রসূল ﷺ সাহাবাবর্গকে বের হতে আদেশ দিয়ে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বনী কুরাইযাহ ছাড়া অন্য স্থানে আসরের নামায না পড়ে।" *(বুখারী ৯৪৬ নং, মুসলিম)*

মহানবী ﷺ-এর এই আদেশ বুঝতে সাহাবাগণ মতভেদ করলেন। একদল সাহাবা বুঝলেন, রসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য হল, আমরা যেন এত শীঘ্র বের হয়ে যাই, যাতে বনী কুরাইযাহতে পৌঁছেই আসরের সময় হয়। (উদ্দেশ্য বনী কুরাইযাহতে আসরের নামায আদায় নয়।) সুতরাং শীঘ্রতা সত্ত্বেও যখন পথিমধ্যেই আসরের সময় হয়ে গেল, তখন তাঁরা পথেই নামায পড়ে নিলেন এবং যথাসময় অতিক্রম হতে দিলেন না।

পক্ষান্তরে অন্য দল বুঝলেন, রসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য হল, তাঁরা যেন বনী কুরাইযাতে পৌঁছেই আসরের নামায আদায় করেন। (এবং অন্য কোথাও নামায না পড়েন।) সুতরাং তাঁরা যথাসময় পার করে বনী কুরাইযাতে পৌঁছেই আসরের নামায আদায় করলেন। নবী ﷺ এ মতভেদ সম্পর্কে অবগত হলেন এবং কোন দলের বুঝকেই ভ্রান্ত বললেন না।

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, দুই ব্যক্তি সফরে বের হল। নামাযের সময় হলে তাদের নিকট পানি না থাকার কারণে তায়াম্মুম করে উভয়েই নামায পড়ে নিল। অতঃপর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই তারা পানি পেয়ে গেল। ওদের মধ্যে একজন পানি দ্বারা ওযু করে পুনরায় ঐ নামায ফিরিয়ে পড়ল। কিন্তু অপর জন পড়ল না। তারপর তারা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এলে ঘটনা খুলে বলল। তিনি যে নামায ফিরিয়ে পড়েনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমার আমল সুন্নাহর অনুসারী হয়েছে এবং তোমার নামাযও যথেষ্ট (শুদ্ধ) হয়ে গেছে।" আর যে ওযু করে নামায ফিরিয়ে পড়েছিল, তার

উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "তোমার জন্য ডবল সওয়াব।" *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত ৫৩৩নং)*

সুতরাং বলা যায় যে, ইজতিহাদের প্রয়োজন পড়ে তখন, যখন উপস্থিত সমস্যার সমাধানে কুরআন-হাদীসে কোন উক্তি না থাকে। আর এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ।

দ্বিতীয়তঃ উক্তি আছে, কিন্তু তা স্পষ্ট নয়, বরং দ্ব্যর্থবোধক। সে ক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যায় ইজতিহাদী মতভেদ সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়তঃ নবী ﷺ-এর নিকট থেকে বর্ণিত (সহীহ, হাসান, যয়ীফ, জাল) হাদীসের বর্ণনাসূত্রের নানা পর্যায়-ভিন্নতার কারণে হাদীস গ্রহণ-বর্জন রীতি অনুসারে বহু ইজতিহাদী মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

আর স্বাভাবিক মতভেদ শরীয়তের প্রশস্ততা ও সরলতার প্রমাণ।

ফিক্বহী মতানৈক্যের উদ্ভব

মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় সাহাবাগণের ইজতিহাদী মতভেদের কোন প্রভাব ছিল না। কারণ তিনি তাঁদের মাঝে বর্তমান ছিলেন এবং তাঁরা প্রয়োজনে তাঁর নিকট রুজু করতেন। ফলে সাথে সাথে তিনি তাঁদের জন্য সঠিক ফায়সালা দিতেন। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর সাহাবাবর্গ অন্য স্তরে পদার্পণ করলেন, আর তা হল নবোদ্ভূত নানা সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদ। অতঃপর তাঁরা এবং তাঁদের শিষ্যগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। ফলে তাঁদের ঐ সকল নতুন নতুন সমস্যার ইজতিহাদী সমাধান, যা তাঁরা কুরআন-হাদীস মন্থন ক'রে বের করেন---নানাবিধ রূপ ধারণ করে। আর এইভাবে পরবর্তীতে নানা মযহাবের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

পরবর্তীতে অধিক মাত্রায় মতভেদের ফলে মুসলিমদের মাঝে নানা বিঘ্ন ও বিপত্তির উৎপত্তি হয় এবং তা নিরসন-কল্পে কেবল চারটি মযহাব স্বীকৃতি ও প্রসিদ্ধি পায়। যেহেতু চারটি মযহাবের অনুসারী সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তাই।

ধারাবাহিকভাবে চার মযহাব ও তার ইমামগণ

১। হানাফী মযহাব। ইমাম আবূ হানীফা নু'মান বিন সাবেত (রঃ)এর দিকে সম্পর্ক জুড়ে এ মযহাব প্রসিদ্ধি পায়। এঁর জন্ম ৮০ হিজরীতে এবং মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে।

২। মালেকী মযহাব। ইমাম মালেক বিন আনাস (রঃ)এর দিকে সম্পর্ক জুড়ে এ মযহাব প্রসিদ্ধি পায়। এঁর জন্ম ৯৩ হিজরীতে এবং মৃত্যু ১৭৯ হিজরীতে।

৩। শাফেয়ী মযহাব। ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফেয়ী (রঃ)এর দিকে সম্পর্ক জুড়ে এ মযহাব প্রসিদ্ধি পায়। এঁর জন্ম ১৫০ হিজরীতে এবং মৃত্যু ২০৪ হিজরীতে।

৪। হাম্বলী মযহাব। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ)এর দিকে সম্পর্ক জুড়ে এ মযহাব প্রসিদ্ধি পায়। এঁর জন্ম ১৬৪ হিজরীতে এবং মৃত্যু ২৪১ হিজরীতে।

জ্ঞাতব্য যে, ইমাম আহমাদ ইমাম শাফেয়ীর এবং ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেকের ছাত্র ছিলেন। (রাহিমাহুমুল্লাহু আজমাঈন।)

উল্লেখ্য যে, কোন নির্দিষ্ট মযহাবের অন্ধানুকরণ করা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। জরুরী হল তাঁদের ইজতিহাদী সেই মতের অনুসরণ করা, যা কুরআন ও হাদীসের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী। এ কথাই প্রত্যেক ইমাম বলে গেছেন।

ইসলাম ও তার রুক্নসমূহ

❁ ইসলামের সংজ্ঞা ঃ

ইসলামের মূল ধাতু হল 'সিল্ম', তার অর্থ 'শান্তি'।

ইসলাম মানে ঃ আত্মসমর্পণ। শরয়ী পরিভাষায় ঃ আল্লাহর কাছে তাওহীদের সাথে আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা এবং শির্ক ও মুশরিক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

'ইসলাম' সমস্ত নবী-রসূলের দ্বীনের নাম।

❁ ইসলামের রুক্ন ৫টি

১। কালেমা ঃ এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রসূল।

২। নামায কায়েম করা।

৩। যাকাত প্রদান করা।

৪। রমযান মাসের রোযা পালন করা।

৫। বাইতুল্লাহর হজ্জ করা।

প্রথম রুক্ন ঃ কালেমা

কালেমায় মুসলিম ঘোষণা করে যে, মহান আল্লাহই একমাত্র মা'বূদ,

ইবাদত কেবল তাঁরই করতে হবে। তাঁকে ছেড়ে অথবা তাঁর সাথে অন্যের ইবাদত করা যাবে না। বরং কেবল তাঁরই ইবাদত করার জন্য তিনি মানব ও দানবকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (٥٦) سورة الذاريات

অর্থাৎ, আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল সৃষ্টি করেছি এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। *(যারিয়াত ঃ ৫৬)*

বরং মুসলিমের জীবন-মরণ সবই আল্লাহর জন্য। তিনি বলেন,

{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } (١٦٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, 'নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি। আর আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের মধ্যে আমিই প্রথম।' *(আনআম ঃ ১৬২-১৬৩)*

❁ কালেমা শাহাদতের শব্দাবলী

أَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ.

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রসূল।

দ্বিতীয় রুক্ন ঃ নামায

নামাযের আরবী শব্দ 'সালাত'। 'সালাত' মানে দুআ বা প্রার্থনা।

শরয়ী পরিভাষায় নামায ঃ নির্দিষ্ট কিছু বাক্য ও ক্রিয়ার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা, যা শুরু হয় তাকবীর দিয়ে এবং শেষ হয় সালাম দিয়ে।

❁ ইসলামে নামাযের মর্যাদা

ইসলামে নামাযের সুউচ্চ মর্যাদা ও মাহাত্ম্য রয়েছে। যেহেতু ঃ-

(ক) নামায ইসলামের দ্বিতীয় রুক্ন।

(খ) নামায সর্বশ্রেষ্ঠ আমল।

(গ) নামায ইসলামের খুঁটি।

(ঘ) নামায মুসলিম ও কাফেরের মাঝে পার্থক্যকারী নিদর্শন।

(ঙ) নামায ফরয হয় সাত আসমানের উপরে মি'রাজের রাতে সরাসরি আল্লাহর আদেশে।

❁ নামাযের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ ইব্রাহীম ﷺ-এর জবানি বলেন,

{رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء} (٤٠) إبراهيم

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দুআ কবুল কর। *(ইব্রাহীম ঃ ৪০)*

মহান আল্লাহ মূসা ﷺ-এর সাথে আলাপকালে বলেন,

{إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (١٤) سورة طه

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই; অতএব আমার উপাসনা কর এবং আমাকে স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর। *(ত্বা-হা ঃ ১৪)*

তিনি ঈসা ﷺ-এর জবানি বলেন,

{وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا}

অর্থাৎ, যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আজীবন নামায ও যাকাত আদায় করতে। *(মারয়্যাম ঃ ৩১)*

তিনি শেষনবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

{اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} (٤٥) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অহী করা হয়েছে তা পাঠ কর এবং যথাযথভাবে নামায পড়। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন। *(আনকাবূত ঃ ৪৫)*

তিনি মু'মিনদের জন্য বলেন,

{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} (١٠٣) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় নামাযকে বিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত সময়ে অবশ্য কর্তব্য করা হয়েছে। *(নিসা ঃ ১০৩)*

۞ নামাযের মাহাত্ম্য

১। নামায নূর (জ্যোতি)।

এ কথা বলেছেন আল্লাহর রসূল ﷺ। *(মুসলিম ২২৩নং)*

২। নামায গোনাহসমূহের কাফ্ফারা (পাপমোচনকারী)।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ } (١١٤) سورة هود

অর্থাৎ, নামায কায়েম কর দিবসের দু'প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মুছে ফেলে; এটা হচ্ছে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ। *(হূদ ঃ ১১৪)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ ». قَالُوا لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ، قَالَ «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا».

অর্থাৎ, আচ্ছা তোমরা বল তো, যদি কারোর বাড়ির দরজার সামনে একটি নদী থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার ক'রে গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি?" সাহাবীরা বললেন, 'না,) কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না।' তিনি বললেন, "পাঁচ অক্তের নামাযের উদাহরণও সেইরূপ। এর দ্বারা আল্লাহ পাপরাশি নিশ্চিহ্ন ক'রে দেন।" *(বুখারী, মুসলিম)*

৩। কিয়ামতে সর্বপ্রথম হিসাব হবে নামাযের।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বান্দার (হক্কুল্লাহর মধ্যে) যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে, তা হচ্ছে তার নামায। সুতরাং যদি তা সঠিক হয়, তাহলে সে পরিত্রাণ পাবে। আর যদি (নামায) পণ্ড ও খারাপ হয়, তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয (ইবাদতের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায়, তাহলে প্রভু বলবেন, 'দেখ তো!

আমার বান্দার কিছু নফল (ইবাদত) আছে কি না, যা দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ ক'রে দেওয়া হবে?' অতঃপর তার অবশিষ্ট সমস্ত আমলের হিসাব ঐভাবে গৃহীত হবে। *(আহমাদ, তিরমিযী)*

৪। নামায জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভের কারণ।

মহান আল্লাহ মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা ক'রে বলেন,

{وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٤) أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ} (٣٥) سورة المعارج

অর্থাৎ, ...এবং যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান---তারা সম্মানিত হবে জান্নাতে। *(মাআরিজ ঃ ৩৪-৩৫)*

রাবীআহ ইবনে কা'ব আসলামী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রাত কাটাতাম। আমি তাঁর কাছে ওযূর পানি এবং প্রয়োজনীয় বস্তু এনে দিতাম। (একদিন তিনি খুশী হয়ে) বললেন, "তুমি আমার কাছে কিছু চাও।" আমি বললাম, 'আমি আপনার কাছে জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই।' তিনি বললেন, "এ ছাড়া আর কিছু?" আমি বললাম, 'বাস্ ওটাই।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি, অধিকাধিক সিজদা করে (নামায পড়ে) তোমার (এ আশা পূরণের) জন্য আমাকে সাহায্য কর।" *(মুসলিম)*

۞ নামায ফরয হওয়ার যৌক্তিকতা

মুসলিমের উপর নামায ফরয করা হয়েছে নানা উপকারিতা ও কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে। যেমন ঃ-

(ক) নামায সর্বদা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক বজায় রাখে।

(খ) নামায ঈমানকে শক্তিশালী করে।

(গ) বিপদে-আপদে সান্ত্বনা দেয় নামায।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ } (٤٥) البقرة

অর্থাৎ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন। *(বাক্বারাহ ঃ ৪৫)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} (١٥٣)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। *(ঐ ঃ ১৫৩)*

মহানবী ﷺ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে নামায শুরু করতেন। *(আহমাদ, আবূ দাউদ)* আর তিনি বলতেন, 'হে বিলাল! নামাযের ইক্বামত দিয়ে আমার মনকে প্রশান্তি দাও।' *(আহমাদ, ৫/৩৭১, আবূ দাউদ)*

۞ নামায ত্যাগকারীর বিধান

যে ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করে, সঠিকমতে সে কাফের। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মানুষ ও কুফরীর মধ্যে (পর্দা) হল, নামায ত্যাগ করা।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে চুক্তি আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে বিদ্যমান, তা হচ্ছে নামায (পড়া)। অতএব যে নামায ত্যাগ করবে, সে নিশ্চয় কাফের হয়ে যাবে।" *(তিরমিযী)*

শাক্বীক ইবনে আব্দুল্লাহ তাবেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহচরবৃন্দ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরীমূলক কাজ বলে মনে করতেন না।' *(তিরমিযী)*

তৃতীয় রুক্ন ঃ যাকাত

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}

(৫৬)

অর্থাৎ, তোমরা যথাযথভাবে নামায পড়, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য কর; যাতে তোমরা করুণাভাজন হতে পার। *(নূর ঃ ৫৬)*

۞ যাকাতের সংজ্ঞা

কতিপয় শর্তসাপেক্ষে সম্পদে অপরিহার্য সদকা, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পরিমাণে, নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য।

۞ যাকাতের উপকারিতা

১। মহান আল্লাহর আনুগত্য করা হয়। যেহেতু যাকাত আর্থিক ইবাদত।
২। নিঃস্ব ও অভাবীদের সাহায্য করা হয়।
৩। কার্পণ্য থেকে মুক্তিলাভ এবং দানশীলতা ও মহানুভবতার শিক্ষা গ্রহণ।
৪। যাকাত আদায়ের মাঝে মুসলিমদের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।
৫। যাকাতে মাল বৃদ্ধি পায়।

۞ যাকাত আদায় না করার শাস্তি

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} (٣٥) التوبة

অর্থাৎ, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

(৩৫) যেদিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশ দাগা হবে, (আর বলা হবে,) 'এ হচ্ছে তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চিত জিনিসের স্বাদ গ্রহণ কর।' *(তাওবাহ ঃ ৩৪-৩৫)*

{وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (١٨٠) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আল্লাহ তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তাতে কৃপণতা করলে তাতে তাদের মঙ্গল আছে। বরং এ (কৃপণতা) তাদের জন্য অমঙ্গল। তারা যে ধনে কৃপণতা করে, কিয়ামতের দিন ঐটিই তাদের গলার বেড়ি হবে। *(আলে ইমরান ঃ ১৮০)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক সোনা ও চাঁদীর অধিকারী ব্যক্তি, যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তার জন্য ঐ সমুদয় সোনা-চাঁদীকে আগুনে দিয়ে বহু পাত তৈরী করা হবে। অতঃপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্দ্বারা তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগা হবে। যখনই সে পাত ঠান্ডা হয়ে যাবে তখনই তা পুনরায় গরম করে অনুরূপ দাগার শাস্তি সেই দিনে চলতেই থাকবে যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে; হয় জান্নাতের দিকে না হয় জাহান্নামের দিকে।....." *(বুখারী ২৩৭১, মুসলিম ৯৮৭নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যাকাত আদায় করে না এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জাহান্নামে যাবে।" *(ত্বাবারানীর সাগীর, সহীহ তারগীব ৭৫৭নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে জাতিই যাকাত প্রদানে বিরত থেকেছে সে জাতিকেই আল্লাহ দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত করেছেন।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব,*

হাকেম, বাইহাকীও অনুরূপ, সহীহ তারগীব ৭৫৮-নং)

۞ যে সব সম্পদে যাকাত ফরয

১। স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুদ্রা
২। ব্যবসার সামগ্রী (পণ্যদ্রব্য)
৩। চতুষ্পদ জন্তু
৪। শস্য ও ফল

۞ যাকাতের হকদারগণ

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (٦٠)

অর্থাৎ, (ফরয) স্বাদক্বাসমূহ শুধুমাত্র নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত এবং স্বাদক্বাহ (আদায়ের) কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের মনকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করা আবশ্যক তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে (সংগ্রামকারী) ও (বিপদগ্রস্ত) মুসাফিরের জন্য। এ হল আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত (বিধান)। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। *(তাওবাহ ঃ ৬০)*

চতুর্থ রুক্ন ঃ রমযানের রোযা

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١٨٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পার। *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৩)*

۞ রোযা বা সিয়ামের সংজ্ঞা

'সিয়াম' মানে বিরত থাকা। শরয়ী পরিভাষায় ঃ ইবাদতের নিয়তে ফজর উদয়ের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার-সহ অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী জিনিস থেকে বিরত থাকার নাম রোযা বা 'সিয়াম'।

۞ রোযার ফযীলত

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ বলেন, 'আদম সন্তানের প্রতিটি সৎকর্ম তার জন্যই; কিন্তু রোযা স্বতন্ত্র, তা আমারই জন্য, আর আমিই তার প্রতিদান দেব।' রোযা ঢালস্বরূপ অতএব তোমাদের কেউ যেন রোযার দিনে অশ্লীল না বলে এবং হৈ-হট্টগোল না করে। আর যদি কেউ তাকে গালি-গালাজ করে অথবা তার সাথে লড়াই-ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, 'আমি রোযা রেখেছি।' সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন আছে, নিঃসন্দেহে রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মৃগনাভির সুগন্ধ অপেক্ষা বেশী উৎকৃষ্ট। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দময় মূহূর্ত রয়েছে, তখন সে আনন্দিত হয়; (১) যখন সে ইফতার করে (ইফতারের জন্য সে আনন্দিত হয়)। আর (২) যখন সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, স্বীয় রোযার জন্য সে আনন্দিত হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম, এই শব্দগুলি বুখারীর)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "আদম সন্তানের প্রত্যেক সৎকর্ম কয়েকগুণ বর্ধিত করা হয়। একটি নেকী দশগুণ থেকে নিয়ে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'কিন্তু রোযা ছাড়া। কেননা, তা আমার উদ্দেশ্যে (পালিত) হয়। আর আমি নিজেই তার পুরস্কার দেব। সে পানাহার ও কাম প্রবৃত্তি আমার (সন্তুষ্টি অর্জনের) উদ্দেশ্যেই বর্জন করে।' রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দময় মুহূর্ত রয়েছে। একটি আনন্দ হল ইফতারের সময় এবং অপরটি হবে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। আর নিশ্চয় তার মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মৃগনাভির সুগন্ধ অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট।"

۞ রোযার উপকারিতা

১। মহান আল্লাহর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার হয়।
২। তাক্বওয়া ও পরহেযগারীর প্রশিক্ষণ হয়।
৩। ধৈর্যশীলতার অনুশীলন হয়।
৪। কাবীরা গোনাহ থেকে দূরে থাকলে আগামী রমযান পর্যন্ত সকল সাগীরাহ গোনাহর কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হয়ে যায়। *(আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী)*
৫। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সঠিক ঈমান রেখে সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখে, মহান আল্লাহ তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ ক'রে দেন। *(বুখারী-মুসলিম)*
৬। রোযা অবস্থায় রোযাদারের দুআ কবুল হয়। *(সিঃ সহীহাহ ১৭৯৭নং)*
৭। রোযা রাখলে রোগী অনেক রোগ থেকে মুক্তি পায়। জন্ডিস, হ্যাপাটাইটিস, প্লীহা, বদহজম, যকৃৎ, ফ্যাট বা চর্বিজাতীয় সকল প্রকার

রোগে উপকার দেয় রোযা।

৮। যৌন-পীড়িত যুবকদের যৌন-পীড়ন দমন করে এই রোযা।

৯। ভাল কাজে অভ্যাসী বানায় এই রোযা, এই রমযান। মন্দ কাজ বর্জন করতে অভ্যাসী হয় রোযাদার।

১০। রোযার মাসে মুসলিমদের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ সুন্দররূপে পরিস্ফুটিত হয়।

১১। পরকালে রয়েছে রোযাদারের জন্য খাস বেহেশ্‌ত, যার নাম 'রাইয়ান'। *(বুখারী-মুসলিম)*

۞ রোযা বিনষ্টকারী বস্তুসমূহ

১। যৌন-সঙ্গম করা।

২। অন্যভাবে বীর্যপাত করা।

৩। পানাহার করা। (ধুমপানও পানাহারের পর্যাভুক্ত।)

৪। পানাহারের সদৃশ কিছু ব্যবহার করা। (স্যালাইন নেওয়া ইত্যাদি।)

৫। ইচ্ছাকৃত বমি করা।

৬। অতিরিক্ত রক্ত বের করা।

৭। মহিলাদের মাসিক অথবা প্রসবোত্তর রক্তস্রাব থাকা।

অনিচ্ছাকৃত, ভুলবশতঃ বা বাধ্যতাবশতঃ কারণে রোযা বিনষ্টকারী কোন জিনিস ঘটে গেলে তাতে রোযা ভাঙ্গে না।

۞ ফিতরার যাকাত

প্রাসঙ্গিকভাবে ফিতরার কথা উল্লেখযোগ্য।

দেশে প্রচলিত প্রধান খাদ্য হতে এক সা' (মোটামুটি আড়াই কিলো) পরিমাণ ফিতরা দিতে হবে।

প্রত্যেক মুসলিম ছোট-বড়, রোযাদার-বেরোযাদার সকলের তরফ থেকে গরীবদের জন্য তা দান করতে হবে।

ফিতরা ঈদের নামাযের আগে দিতে হবে। এক অথবা দু'দিন আগেও বের করা চলে।

পঞ্চম রুক্‌ন ঃ বাইতুল্লাহর হজ্জ

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّه غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } (٩٧) سورة آل عمران

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ জগতের প্রতি অমুখাপেক্ষী। *(আলে ইমরান ঃ ৯৭)*

۞ হজ্জের উদ্দেশ্য

মহানবী ﷺ বলেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْىُ الْجِمَارِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ.

অর্থাৎ, কা'বাগৃহের তওয়াফ, স্বাফা-মারওয়ার সাঈ এবং জামরাতের পাথর নিক্ষেপ একমাত্র আল্লাহ যিক্‌র প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। (আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী প্রমুখ, হাদীসটি আলবানীর নিকট যয়ীফ। তবে এর অর্থ শুদ্ধ।)

۞ হজ্জের ফযীলত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করল এবং (তাতে) কোন অশ্লীল কাজ করল না ও পাপাচার করল না, সে ব্যক্তি ঠিক ঐ দিনকার মত (নিষ্পাপ হয়ে) বাড়ি ফিরবে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.

অর্থাৎ, একটি উমরাহ পরবর্তী উমরাহ পর্যন্ত ঐ দুইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত পাপরাশির জন্য কাফ্‌ফারা (মোচনকারী) হয়। আর 'মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

۞ হজ্জের উপকারিতা

১। হজ্জ পালনে মহান আল্লাহর আনুগ্যত ও বশ্যতা স্বীকার হয়।

২। ইসলাম যে আন্তর্জাতিক দ্বীন, সে কথার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

৩। ইসলামী বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহামিলনের পরম অভিব্যক্তি ঘটে।

৪। হাশর বা মহাসমাবেশ কিয়ামতের দিন স্মরণ হয়।

পবিত্রতার বিধান

"পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান।" *(সহীহ মুসলিম)*

ইসলামে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার বড় গুরুত্ব আছে।

পবিত্রতাকে নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্ত নির্ধারিত করা হয়েছে।

মুসলিমকে বিভিন্ন কারণে গোসল করতে---বিশেষ ক'রে জুমআর দিন--গোসল করতে আদেশ করেছে।

নিয়মিত দাঁত-মুখ পরিষ্কার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

এমন লোম পরিষ্কার করতে আদেশ করেছে, যা দুর্গন্ধ ও ময়লা বহন করে।

লোকেদের পথে-ঘাটে ও বসার জায়গায় প্রস্রাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছে।

আর মহান আল্লাহ পরিচ্ছন্ন লোকদেরকে ভালবাসেন। তিনি বলেন,

{إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (٢٢٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন। *(বাক্বারাহ ঃ ২২২)*

۞ পবিত্রতার প্রকারভেদ

মুসলিম সর্বতোভাবে পবিত্র থাকতে আদিষ্ট হয়েছে। আর সে পবিত্রতা দুই প্রকার ঃ-

১। আভ্যন্তরিক পবিত্রতা

আর তা হল মনের পবিত্রতা। সুতরাং মনকে কুফরী, মুনাফিক্বী, শির্ক, অমূলক বিশ্বাস, সন্দেহ ও সংশয়, অহংকার, বিদ্বেষ, লালসা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, ক্রোধ, মোহ, অবৈধ প্রেম ইত্যাদি থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

২। বাহ্যিক পবিত্রতা

এই পবিত্রতাও আবার দুই প্রকার ঃ-

(ক) অপবিত্র বস্তু থেকে দেহের পবিত্রতা সাধন। যেমন মলমূত্র বা অন্য কোন নাপাক জিনিস থেকে দেহকে পরিষ্কার রাখা।

(খ) অপবিত্র দেহের পবিত্রতা সাধন। আর এটিও দুই প্রকার ঃ-

প্রথম ঃ ছোট নাপাকী থেকে দেহের পবিত্রতা সাধন। যা কেবল ওযূ ক'রে লাভ হয়।

দ্বিতীয় ঃ বড় নাপাকী থেকে দেহের পবিত্রতা সাধন। যা ফরয গোসল ক'রে লাভ হয়।

পানির বিধান

পানি দুই প্রকার ঃ পবিত্র ও অপবিত্র।

(ক) পবিত্র পানি তাই, যা তার সৃষ্টিগত মৌলিক গুণে অবশিষ্ট থাকে। যেমন বৃষ্টির পানি, সমুদ্র, নদী, ঝরনা ও কূপের পানি।

এই পানি পবিত্রতা সাধনে ব্যবহার্য। যেহেতু তা পবিত্র ও পবিত্রকারী।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا} (٤٨) سورة الفرقان

অর্থাৎ, আমি আকাশ হতে পবিত্র পানি বর্ষণ করি। *(ফুরক্বান ঃ ৪৮)*

{وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} (١١) سورة الأنفال

অর্থাৎ, তিনি আকাশ হতে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যাতে তা দিয়ে তোমাদেরকে পবিত্র করেন। *(আনফাল ঃ ১১)*

আল্লাহর নবী ﷺ সমুদ্রের পানি সম্বন্ধে বলেছেন,

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

অর্থাৎ, তার পানি পবিত্র এবং মৃত হালাল। *(আহমাদ, সুনানে আরবাআহ)*

(খ) অপবিত্র পানি

যে পানিতে কোন অপবিত্র জিনিস মিশ্রিত হয়ে তার স্বাদ, গন্ধ বা রঙ পরিবর্তন ক'রে দেয়, তা অপবিত্র পানি; যদিও তা পরিমাণে বেশি হয়। যেমন ঃ-

(১) বহমান রক্ত মিশ্রিত পানি।

(২) নর্দমার পানি।

(৩) মৃত প্রাণী বা মলমূত্র পড়ে থাকার ফলে দুর্গন্ধময় পানি।

এ পানি দ্বারা ওযূ-গোসল জায়েয নয়।

পক্ষান্তরে কোন পবিত্র বস্তু মিশ্রিত হওয়ার ফলে বিকৃত পানি অপবিত্র হয় না। যেমন পবিত্র মাটি, সাবান-শ্যাম্পু, জং ইত্যাদি মিশ্রিত হওয়ার কারণে পানি নাপাক হয় না। এ পানিতে ওযূ-গোসল বৈধ।

পক্ষান্তরে কোন পবিত্র বস্তু মিশ্রিত হয়ে যদি পানির নামই বদলে দেয়, তাহলে তা পাক হলেও তাতে ওযূ-গোসল চলবে না। যেমন চা, জুস, শরবত, রঙ ইত্যাদি।

ইস্তিঞ্জা বা শৌচকর্ম

প্রস্রাব-পায়খানার পর শৌচকর্ম দুইভাবে হয়। পবিত্র পানি দিয়ে ধুয়ে।

অথবা ঢিল ইত্যাদি দিয়ে মুছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে ঃ-

১। যে জিনিস দিয়ে মুছা হবে, তা যেন পবিত্র হয়।

২। তা যেন অপবিত্রতা দূরীভূত করে।

৩। তা যেন হাড় অথবা শুকনো গোবর না হয়।

৪। তা যেন কোন সম্মানযোগ্য বস্তু না হয়, যেমন কোন খাদ্যবস্তু অথবা এমন কাগজ, যাতে আল্লাহর নাম অথবা তা'যীমযোগ্য কোন কথা লেখা আছে।

সালমান ফারেসী ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, আমরা যেন প্রস্রাব-পায়খানার সময় ক্বিবলাকে সামনে না করি, ডান হাত দিয়ে শৌচকর্ম না করি, তিনটির কম ঢিল দিয়ে (প্রস্রাব-পায়খানা) পরিষ্কার না করি অথবা গোবর বা হাড় দিয়ে পরিষ্কার না করি।' *(মুসলিম ২৬২নং)*

প্রকাশ থাকে যে, তিনটি ঢিলে পরিষ্কার না হলে আরো অতিরিক্ত বেজোড় ঢিল ব্যবহার করা যায়।

ওযূ

ওযূর আভিধানিক অর্থ ঃ সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা।

পারিভাষিক অর্থ ঃ পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কতিপয় অঙ্গে নির্দিষ্ট নিয়মে পানি ব্যবহার করা।

তিনটি কর্ম করার জন্য ওযূ করা ওয়াজেব। নামায, তওয়াফ ও কুরআন স্পর্শ। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর। *(মাইদাহ ঃ ৬)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ বেওযূ হলে ওযূ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার নামায কবুল করবেন না। *(বুখারী, মুসলিম ৫৫৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

مِفتاحُ الصلاة الطُّهورُ.

অর্থাৎ, নামাযের চাবি হল পবিত্রতা। (আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

সর্বদা ওযূ অবস্থায় থাকা মু'মিনের গুণ। বিশেষ ক'রে আল্লাহর যিক্র, দুআ ও শোবার আগে ওযূ করা মুস্তাহাব।

ওযূর ফযীলত

১। মহান আল্লাহর ভালবাসা লাভ হয়। তিনি বলেছেন,

{إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (٢٢٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকে ভালবাসেন। *(বাক্বারাহ ঃ ২২২)*

২। গোনাহ ঝরে যায়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

অর্থাৎ, মুসলিম বা মু'মিন বান্দা যখন ওযূর উদ্দেশ্যে তার মুখমন্ডল ধৌত করে, তখন ওযূর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায়, যা সে দুই চক্ষুর দৃষ্টির মাধ্যমে ক'রে ফেলেছিল। অতঃপর যখন সে তার হাত দু'টিকে ধৌত করে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায়, যা সে উভয় হাত দ্বারা ধারণ করার মাধ্যমে ক'রে ফেলেছিল। অতঃপর যখন সে তার পা দু'টিকে ধৌত করে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায়, যা সে তার দু'পায়ে চলার মাধ্যমে ক'রে ফেলেছিল। শেষ অবধি সমস্ত গোনাহ থেকে সে পবিত্র হয়ে বের হয়ে আসে। *(মুসলিম)*

৩। বান্দার মর্যাদা বর্ধন হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা সমবেত সহচরদের উদ্দেশ্যে) বললেন, "তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলব না কি, যার দ্বারা আল্লাহ

গোনাহসমূহকে মোচন করে দেবেন এবং (জান্নাতে) তার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন?" তাঁরা বললেন, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "(তা হচ্ছে) কষ্টকর অবস্থায় পরিপূর্ণরূপে ওযূ করা, অধিক মাত্রায় মসজিদে গমন করা এবং এক অক্তের নামায আদায় ক'রে পরবর্তী অক্তের নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। আর এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ। এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ।" *(মুসলিম)*

৪। ওযূর অঙ্গগুলি কিয়ামতে চমকাবে এবং সেটাই হবে উম্মতে মুহাম্মাদীর নিদর্শন। *(বুখারী ১৩৬, মুসলিম ২৪৬নং)*

৫। ওযূর অঙ্গগুলি জান্নাতে অলংকৃত করা হবে।

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি আমার বন্ধু নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "ওযুর পানি যদ্দূর পৌঁছবে তদ্দূর মুমিনের অঙ্গে অলংকার (জ্যোতি) শোভমান হবে।" *(মুসলিম ২৫০নং)*

❁ ওযূর শর্তাবলী

১। পবিত্রতার্জনের নিয়ত (সংকল্প) করা।

২। পাক পানি ব্যবহার করা।

৩। বৈধ পানি ব্যবহার করা। (চুরি বা ছিন্তাই করা পানিতে ওযূ হয় না।)

৪। ওযূর পূর্বে শৌচকর্ম বাকী থাকলে সেরে নেওয়া।

৫। ওযূর অঙ্গগুলি থেকে পানি-রোধক বস্তু দূরীভূত করা। (যেহেতু পেন্ট, নখ-পালিশ, টিপ, আঠা ইত্যাদি লেগে থাকলে এবং তার নিচে চামড়ায় পানি না পৌঁছলে ওযূ হবে না।)

❁ ওযূর ফরযসমূহ

১। পূর্ণ চেহারা ধৌত করা। (কুল্লি করা ও নাকে পানি নেওয়া এরই শামিল।)

২। হাতদু'টিকে কনুই পর্যন্ত ধৌত করা।

৩। মাথা (ও কান) মাসাহ করা।

৪। পাদু'টিকে গাঁট পর্যন্ত ধৌত করা।

৫। ধারাবাহিকতা ও পর্যায়ক্রম বজায় রাখা।

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর। *(মাইদাহ ঃ ৬)*

❁ ওযূর সুন্নতসমূহ

১। শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা। (মতান্তরে তা বলা ওয়াজেব।)

২। কব্জি পর্যন্ত তিনবার হাত ধোয়া। (ঘুম থেকে উঠার পর ধোয়া ওয়াজেব।)

২। (মাথা ও কান মাসাহ ছাড়া) ওযূর অঙ্গগুলি তিনবার ক'রে ধোয়া।

৩। দাড়ি খেলাল করা।

৪। প্রথমে ডান ও পরে বাম অঙ্গ ধোয়া।

৫। হাত-পায়ের আঙ্গুলের মাঝে খেলাল করা।

৬। মাথার সামনে থেকে শুরু ক'রে ঘাড় পর্যন্ত এবং পুনরায় ঘাড় থেকে মাথার সামনে পর্যন্ত সমস্ত চুলে মাসাহ করা।

৭। আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক পবিত্রতা একীভূত করতে ওযূর শেষে নিম্নের দুআ পাঠ করা,

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلـهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

অর্থঃ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও প্রেরিত দূত (রসূল)। হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

এই দুআ ওযুর পর পড়লে জান্নাতের আটটি দরজা পাঠকারীর জন্য খোলা হয়। *(মুসলিম ১/২০৯, সহীহ তিরমিযী, আলবানী)*

❁ ওযূ করার পদ্ধতি

১। মুসলিম প্রথমে মনে মনে ওযুর নিয়ত করবে। কারণ নিয়ত ছাড়া কোন কর্মই শুদ্ধ হয় না।

২। 'বিসমিল্লাহ' বলে ওযু শুরু করবে। কারণ শুরুতে (ইচ্ছাকৃত) তা না বললে ওযু হয় না।

৩। তিনবার দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নেবে। হাতে ঘড়ি, চুড়ি, আংটি প্রভৃতি থাকলে তা হিলিয়ে তার তলে পানি পৌঁছাবে। আঙ্গুল দিয়ে আঙ্গুলের ফাঁকগুলো খেলাল করবে। এরপর পানির পাত্রে হাত ডুবিয়ে পানি নিতে পারে।

প্রকাশ যে, নখে নখপালিশ বা কোন প্রকার পুরু পেন্ট্ থাকলে তা তুলে

না ফেলা পর্যন্ত ওযু হবে না। পক্ষান্তরে মেহেদী বা আলতা লেগে থাকা অবস্থায় ওযু-গোসল হয়ে যাবে।

৪। তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে ৩ বার কুল্লি করবে।

৫। অতঃপর পানি নিয়ে নাকের গোড়ায় লাগিয়ে টেনে নিয়ে বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়বে। এরূপ ৩ বার করবে। তবে রোযা অবস্থায় থাকলে সাবধানে নাকে পানি টানবে, যাতে গলার নিচে পানি না চলে যায়।

অবশ্য এক লোট পানিতেই একই সাথে অর্ধেক দিয়ে কুল্লি করে বাকি অর্ধেক দিয়ে নাক ঝাড়লেও চলে।

৬। অতঃপর মুখমন্ডল (এক কান থেকে অপর কানের মধ্যবর্তী এবং কপালের চুলের গোড়া থেকে দাড়ির নিচের অংশ পর্যন্ত অঙ্গ) ৩ বার পানি লাগিয়ে দুই হাত দ্বারা ধৌত করবে। এক লোট পানি দাড়ির মাঝে দিয়ে দাড়ির ফাঁকে ফাঁকে আঙ্গুল চালিয়ে তা খেলাল করবে। মহিলাদের কপালে টিপ (?) থাকলে ছাড়িয়ে ফেলে (কপাল) ধুতে হবে। নচেৎ ওযু হবে না।

৭। অতঃপর প্রথমে ডান হাত আঙ্গুলের ডগা থেকে কনুই পর্যন্ত এবং তদনুরূপ বাম হাত ৩ বার (প্রত্যেক বারে পুরো হাতে পানি ফিরিয়ে রগড়ে) ধৌত করবে।

৮। অতঃপর একবার মাথা মাসাহ করবে; নতুন পানি দ্বারা দুই হাতকে ভিজিয়ে আঙ্গুলগুলিকে মুখোমুখি করে মাথার সামনের দিক (যেখান থেকে চুল গজানো শুরু হয়েছে সেখান) থেকে পিছন দিক (গর্দানের যেখানে চুল শেষ হয়েছে সেখান) পর্যন্ত স্পর্শ করে পুনরায় সামনের দিকে নিয়ে এসে শুরুর জায়গা পর্যন্ত পূর্ণ মাথা মাসাহ করবে। মাথায় পাগড়ি থাকলে তার উপরেও মাসাহ করবে।

৯। অতঃপর আর নতুন পানি না নিয়ে ঐ হাতেই দুই কান মাসাহ করবে; শাহাদতের (তর্জনী) দুই আঙ্গুল দ্বারা দুই কানের ভিতর দিক এবং দুই বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা দুই কানের পিঠ ও বাহির দিক মাসাহ করবে।

প্রকাশ যে, গর্দান মাসাহ করা বিধেয় নয়। বরং এটা বিদআত।

১০। অতঃপর প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা গাঁট পর্যন্ত ৩ বার ক'রে রগড়ে ধোবে। কড়ে আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকগুলো খেলাল ক'রে রগড়ে ধৌত করবে।

১১। এরপর হাতে পানি নিয়ে কাপড়ের উপর থেকে শরমগাহে ছিটিয়ে দেবে। বিশেষ করে পেশাব করার পর ওযু করলে এই আমল অধিকরূপে ব্যবহার্য। যেহেতু পেশাব ক'রে তাহারতের পর দু-এক কাতরা পেশাব বের হওয়ার অসঅসা থাকে। সুতরাং পানি ছিটিয়ে দিলে ঐ অসঅসা দূর হয়ে

যায়। এই আমল খোদ জিবরাঈল ﷺ মহানবী ﷺ-কে শিক্ষা দিয়েছেন।

❁ ওযূ যাতে নষ্ট হয়

১। পেশাব ও পায়খানা দ্বার হতে কিছু (পেশাব, পায়খানা, বীর্য, মযী, হাওয়া, রক্ত, কৃমি, পাথর প্রভৃতি) বের হলে ওযু ভেঙ্গে যায়।

তদনুরূপ দেহের অন্যান্য অঙ্গ থেকে (যেমন অপারেশন করে পেট থেকে পাইপের মাধ্যমে) অপবিত্র (বিশেষ করে পেশাব-পায়খানা) বের হলেও ওযু নষ্ট হয়ে যাবে।

২। যাতে গোসল ওয়াজেব হয়, তাতে ওযুও নষ্ট হয়।

৩। কোন প্রকারে বেহুশ বা জ্ঞানশূন্য হলে ওযু নষ্ট হয়।

৪। গাঢ়ভাবে ঘুমিয়ে পড়লে ওযু ভাঙ্গে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "চোখ হল মলদ্বারের বাঁধন। সুতরাং যে ঘুমিয়ে যায়, সে যেন ওযু করে।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩১৬, সহীহুল জামে' ৪১৪৯নং)*

অবশ্য হাল্কা ঘুম বা ঢুল (তন্দ্রা) এলে ওযু ভাঙ্গে না। সাহাবায়ে কিরাম নবী ﷺ এর যুগে এশার নামাযের জন্য তাঁর অপেক্ষা করতে করতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঢুলতেন। অতঃপর তিনি এলে তাঁরা নামায পড়তেন, কিন্তু নতুন করে আর ওযু করতেন না। *(মুসলিম ৩৭৬নং, আবূ দাউদ ১৯৯-২০১নং)*

৫। পেশাব অথবা পায়খানা-দ্বার সরাসরি স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয়। (কাপড়ের উপর থেকে হাত দিলে নষ্ট হয় না।)

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিনা পর্দায় ও অন্তরালে নিজের শরমগাহ স্পর্শ করে, তার উপর ওযু ওয়াজেব হয়ে যায়।" *(সহীহুল জামে' ৩৬২, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৩৫ নং)*

তবে হাতের কব্জির উপরের অংশ দ্বারা স্পর্শ হলে ওযু ভাঙ্গবে না।

৬। উটের গোশ্ত (কলিজা, ভুঁড়ি) খেলে ওযু ভেঙ্গে যায়। এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'উটের গোশ্ত খেলে ওযু করব কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, উটের গোশ্ত খেলে ওযু করো।" *(মুসলিম ৩৬০নং)*

তিনি বলেন, "উটের গোশ্ত খেলে তোমরা ওযু করো।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৩০০৬ নং)*

❁ যে যে কাজের জন্য ওযু জরুরী বা মুস্তাহাব

নামায পড়ার জন্য, কুরআন মাজীদ (মুসহাফ) স্পর্শ করা বা হাতে নেওয়ার জন্য এবং কা'বা শরীফের তওয়াফ করার জন্য ওযু করা জরুরী।

এ ছাড়া কুরআন তেলাঅত, আল্লাহর যিক্র, তেলাঅত ও শুক্রের সিজদা, আযান, সাফা-মারওয়ার সাঈ, বিভিন্ন খোতবা পাঠ ইত্যাদির সময়

ওযু করা মুস্তাহাব।

মোজার উপর মাসাহ

চামড়া বা কাপড়ের (সুতি বা নাইলনের) মোজার উপর মাসাহ বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবী জারীর (রাঃ) (যিনি ওযুর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি) বলেন, 'আমি দেখেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ পেশাব করার পর ওযু করলেন এবং নিজের (চামড়ার) মোজার উপর মাসাহ করলেন।' *(মুসলিম ২৭২নং)*

মুগীরাহ বিন শো'বাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ ওযুর পর (সুতির) মোজা ও জুতোর উপর মাসাহ করেছেন। *(আবূ দাউদ ১৫৯, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, আহমাদ, মিশকাত ৫২৩নং)*

❁ এই মাসাহর শর্তাবলী

এই মাসাহর জন্য ৪টি শর্ত রয়েছে;

১। পা ধুয়ে পূর্ণরূপে ওযু করার পর মোজা পরতে হবে। পূর্বে ওযু না করে মোজা পরে, তারপর তার উপর মাসাহ চলবে না।

সাহাবী মুগীরাহ ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তিনি ওযু করছিলেন। আমি তাঁর মোজা দু'টি খুলে নিতে ঝুঁকলাম। তিনি বললেন, "ছাড়ো, আমি ও দু'টিকে ওযু অবস্থায় পরেছি।" *(বুখারী ২০৬, মুসলিম ২৭৪নং)*

২। মোজা দু'টি যেন পবিত্র হয়। অর্থাৎ, তাতে যেন কোন প্রকারের নাপাকী লেগে না থাকে।

৩। এই মাসাহ যেন সেই পবিত্রতা অর্জনের সময় হয়, যার জন্য কেবল ওযু জরুরী হয়। কারণ, যার জন্য গোসল জরুরী হয়, সেই পবিত্রতা অর্জনের সময় মোজা খুলে দিয়ে পা ধোওয়া জরুরী। *(তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ, ইবনে খুযাইমাহ, মিশকাত ৫২০নং)*

৪। মাসাহ যেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হয়। *(ফাতাওয়া ফিল মাসহি আলাল খুফ্ফাইন, ইবনে উষাইমীন ৩নং)*

❁ মাসাহর সময়কাল

হযরত আলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ মুসাফিরের জন্য ৩ দিন এবং গৃহবাসীর জন্য ১ দিন মোজার উপর মাসাহর সময়-সীমা নির্ধারিত করেছেন। *(মুসলিম ২৭৬)*

এই নির্দিষ্ট সময় শুরু হবে, ওযু করে মোজা পরে ঐ ওযু ভাঙ্গলে তার পরের ওযু করার সময় তার উপর মাসাহ করার পর থেকে। অতএব প্রথম

মাসাহ থেকে ২৪ ঘন্টা গৃহবাসীর জন্য এবং ৭২ ঘন্টা মুসাফিরের জন্য মাসাহ করা বৈধ হবে। সুতরাং যদি কেউ মঙ্গলবারের ফজরের নামাযের জন্য ওযু করার সময় মোজা পরে, তারপর ঐ ওযুতে চার অক্ত নামায পড়ে যদি তার ওযু এশার পর ভাঙ্গে এবং বুধবার ফজরের পূর্বে ওযু করার সময় মাসাহ করে, তাহলে সে গৃহবাসী হলে পর দিন বৃহস্পতিবারের ফজর পর্যন্ত ওযু করার সময় মোজার উপর মাসাহ করতে পারে। অনুরূপ মুসাফির হলে শনিবার ফজর পর্যন্ত মাসাহ করতে পারবে। *(ফাতাওয়া ফিল মাসহি আলাল খুফ্ফাইন, ইবনে উষাইমীন ৮-৯পৃঃ)*

❁ এই মাসাহর নিয়ম

দু'টি হাতকে ভিজিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলগুলিকে ডান পায়ের আঙ্গুলের উপর থেকে শুরু করে পায়ের পাতার উপর দিকে বুলিয়ে নিয়ে গিয়ে পায়ের রলার শুরু পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। আর ঐ একই সাথে একই নিয়মে বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাম পায়ের পাতার উপর মাসাহ করবে। উভয় কানের মাসাহ যেমন একই সঙ্গে হয়, ঠিক তেমনিই উভয় পায়ের মাসাহ একই সঙ্গে হবে। দুই হাত জুড়ে প্রথমে ডান পা, তারপর বাম পা পৃথক করে মাসাহ করা ঠিক নয়। *(ঐ ১৩নং)*

পায়ের তেলোতে ধুলো-বালি থাকলেও তার নিচে মাসাহ করা বিধেয় নয়। হযরত আলী ﷺ বলেন, 'দ্বীনে যদি রায় ও বিবেকের স্থান থাকত, তাহলে মোজার উপরের অংশ অপেক্ষা নিচের অংশই অধিক মাসাহযোগ্য হত। কিন্তু আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে তাঁর মোজার উপরের অংশে মাসাহ করতে দেখেছি।' *(আবূ দাউদ, দারেমী, আহমাদ, মিশকাত ৫২৫নং)*

❁ মাসাহ নষ্ট হয় কিসে?

১। মাসাহর নির্দিষ্ট সময়-সীমা অতিবাহিত হয়ে গেলে।

২। গোসল ফরয হলে।

৩। (মাসাহ করার পর) মোজা খুলে ফেললে।

গোসল করার নিয়ম

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} (٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, তোমরা অপবিত্র থাকলে পবিত্রতা অর্জন কর। *(মাইদাহ ঃ ৬)*

নাপাকীর গোসল করতে হলে গোসলের নিয়ত করে মুসলিম প্রথমে ৩ বার দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুবে। অতঃপর বাম হাতের উপর পানি ঢেলে দেহের নাপাকী ধুয়ে ফেলবে। তারপর বাম হাতকে মাটি অথবা সাবান দ্বারা ধুয়ে নামাযের জন্য ওযু করার মত পূর্ণ ওযু করবে। অবশ্য গোসলের জায়গা পরিষ্কার না হলে পা দুটি গোসল শেষে ধুয়ে নেবে। ওযুর পর ৩ বার মাথায় পানি ঢেলে ভাল করে চুলগুলো ধোবে, যাতে সমস্ত চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর সারা দেহে ৩ বার পানি ঢেলে ভালরূপে ধুয়ে নেবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৩৫-৪৩৬নং)*

মহিলাদের গোসলও পুরুষদের অনুরূপ। অবশ্য মহিলার মাথার চুলে বেণী বাঁধা (চুটি গাঁথা) থাকলে তা খোলা জরুরী নয়। তবে ৩ বার পানি নিয়ে চুলের গোড়া অবশ্যই ধুয়ে নিতে হবে। *(বুখারী, মিশকাত ৪৩৮নং)* নখে নখপালিশ বা কোন প্রকার পুরু পেন্ট্ থাকলে তা তুলে না ফেলা পর্যন্ত গোসল হবে না। পক্ষান্তরে মেহেদী বা আলতা লেগে থাকা অবস্থায় গোসল হয়ে যাবে। কপালে টিপ (?) থাকলে ছাড়িয়ে ফেলে (কপাল) ধুতে হবে। নচেৎ গোসল হবে না।

বীর্যপাত বা সঙ্গম-জনিত নাপাকী ও মাসিকের গোসল, অথবা মাসিক ও ঈদ, অথবা বীর্যপাত বা সঙ্গম-জনিত নাপাকী ও জুমআ বা ঈদের গোসল নিয়ত হলে একবারই যথেষ্ট। পৃথক পৃথক গোসলের দরকার নেই। *(ফিক্বহুস সুন্নাহ উর্দু ৬০পৃঃ দ্রঃ)*

গোসলের পর নামাযের জন্য আর পৃথক ওযুর প্রয়োজন নেই। গোসলের পর ওযু ভাঙ্গার কোন কাজ না করলে গোসলের ওযুতেই নামায হয়ে যাবে। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪৪৫নং)*

রোগ-জনিত কারণে যদি কারো লাগাতার বীর্য, মযী, স্রাব বা ইস্তিহাযার খুন ঝরে তবে তার জন্য গোসল ফরয নয়; প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযুই যথেষ্ট। এই সকল অবস্থায় নামায মাফ নয়। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৫৬০-৫৬১ নং)*

প্রকাশ যে, গোসল, ওযু বা অন্যান্য কর্মের সময় নিয়ত আরবীতে বা নিজ ভাষায় মুখে উচ্চারণ করা বিদআত।

সতর্কতার বিষয় যে, নাপাকী দূর করার জন্য কেবল গা-ধোয়া বা গা ডুবিয়ে নেওয়া যথেষ্ট নয়। পূর্বে ওযু করে যথানিয়মে গোসল করলে তবেই পূর্ণ গোসল হয়। নচেৎ অনেকের মতে কুল্লি না করলে এবং নাকে পানি না নিলে গোসলই শুদ্ধ হবে না। *(মুমতে' ১/৩০৪)*

۞ গোসল কিসে ওয়াজেব হয়?

১। যে কোন প্রকারে সকাম বীর্যপাত হলে। (স্বপ্ন মনে না থাকলেও

গোসল ফরয।)

২। মিলনে বীর্যপাত না হলেও গোসল ফরয।

৩। মহিলাদের মাসিক অথবা প্রসবোত্তর খুন বন্ধ হলে।

৪। অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে। (বিতর্কিত)

৫। মুসলিম মারা গেলে।

۞ গোসলের ওয়াজেবসমূহ

১। পবিত্রতার্জনের নিয়ত করা।

২। সমস্ত দেহ ধৌত করা। (কুল্লি ও নাকে পানি নেওয়া এরই অন্তর্ভুক্ত।)

۞ গোসলের সুন্নতসমূহ

১। শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা।

২। তিনবার কব্জি পর্যন্ত হাত ধোওয়া।

৩। ডান হাত দিয়ে পানি ঢেলে বাম হাত দিয়ে নাপাকী ধুয়ে ফেলা।

৪। পরিপূর্ণ ওযূ করা।

৫। তিনবার মাথা ধোওয়া।

৬। প্রথমে ডান পার্শ্ব ও পরে বাম পার্শ্ব-সহ সারা দেহ ধৌত করা।

۞ যে সব কাজের জন্য গোসল ফরয

১। যে সব কাজের জন্য ওযূ জরুরী, সে সব কাজের জন্য গোসলও জরুরী।

২। মুখস্থ কুরআন পাঠ করার জন্য।

৩। মসজিদে অবস্থান করার জন্য।

নামাযের শর্তাবলী

১। নামাযীকে প্রকৃত মুসলিম হতে হবে।

২। জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। (পাগল বা জ্ঞানশূন্য হবে না।)

৩। বিবেকসম্পন্ন হতে হবে। (সাত বছরের নিম্ন বয়সী শিশু হবে না।)

৪। (ওযু-গোসল করে) পবিত্র হতে হবে।

৫। নামাযের সঠিক সময় হতে হবে।

৬। শরীরের লজ্জাস্থান আবৃত হতে হবে।

৭। শরীর, পোশাক ও নামাযের স্থান থেকে নাপাকী দূর করতে হবে।

৮। কিবলার দিকে মুখ করতে হবে।

৯। মনে মনে নিয়ত করতে হবে।

নামাযের আরকানসমূহ

১। (ফরয নামাযে) সামর্থ্য হলে কিয়াম (দাঁড়ানোর সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়া)।
২। তাকবীরে তাহরীমা।
৩। (প্রত্যেক রাকআতে) সূরা ফাতিহা।
৪। রুকু।
৫। রুকু থেকে উঠে খাড়া হওয়া।
৬। (সাষ্টাঙ্গে) সিজদাহ।
৭। সিজদাহ থেকে উঠে বসা।
৮। দুই সিজদার মাঝে বৈঠক।
৯। শেষ তাশাহহুদ।
১০। তাশাহহুদের শেষ বৈঠক।
১১। উক্ত তাশাহহুদে নবী (ﷺ) এর উপর দরূদ পাঠ।
১২। দুই সালাম।
১৩। সমস্ত রুকনে ধীরতা ও স্থিরতা।
১৪। আরকানের মাঝে তরতীব ও পর্যায়ক্রম।

নামাযের ওয়াজেবসমূহ

১। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া সমস্ত তাকবীর।
২। রুকুর তাসবীহ।
৩। (ইমাম ও একাকী নামাযীর জন্য) 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলা।
৪। (সকলের জন্য) 'রাব্বানা অলাকাল হাম্দ্' বলা।
৫। সিজদার তাসবীহ।
৬। দুই সিজদার মাঝে দুআ।
৭। প্রথম তাশাহহুদ।
৮। তাশাহহুদের প্রথম বৈঠক।

নামাযের সুন্নতসমূহ

১। ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে তা বুকের উপর স্থাপন করা।
২। ইস্তিফতাহ্র দুআ পাঠ করা।
৩। রফ্য়ে য়্যাদাইন করা।

৪। সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা পাঠ করা।
৫। শেষ তাশাহহুদের পর দুআ করা।
৬। তাশাহহুদের সময় তর্জনী হিলিয়ে দুআ করা।
৭। জেহরী নামাযে ইমামের উচ্চৈস্বরে ক্বিরাআত পড়া।

প্রকাশ থাকে যে, ইচ্ছাকৃত কোন রুক্ন ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয়ে যায়। অনিচ্ছাকৃত ছুটে গেলে তা আদায় ক'রে সহু-সিজদা করা আবশ্যক।

আর ইচ্ছাকৃত কোন ওয়াজেব ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয়ে যায়। অনিচ্ছাকৃত ছুটে গেলে তা আদায় করা ওয়াজেব নয়। তবে সহু-সিজদা করা আবশ্যক।

সুন্নত ছুটে গেলে সহু-সিজদার প্রয়োজন নেই।

পাঁচ-ওয়াক্ত নামাযের বিবরণ

নামায	সংখ্যা	সময়
ফজর	২ রাকআত	ফজর উদয় হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।
যোহর	৪ রাকআত	সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পর থেকে আসরের সময় পর্যন্ত।
আসর	৪ রাকআত	প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার সমান হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
মাগরেব	৩ রাকআত	সূর্যাস্তের পর থেকে দিগন্তে তার লাল আভা দূর হওয়া পর্যন্ত।
এশা	৪ রাকআত	লাল আভা দূর হওয়ার পর থেকে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত।

নামাযের পদ্ধতি

আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন,

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

অর্থাৎ, তোমরা সেইভাবে নামায পড়, যেভাবে আমাকে পড়তে দেখছ। *(বুখারী)*

❁ নামাযে মনোনিবেশ

নামাযী যে নামায পড়তে চলেছে, সে নামাযের নিয়ত ক'রে অতি বিনয় সহকারে, একাগ্রচিত্তে, আদবের সাথে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ লোক-প্রদর্শন, লোক-ভয় বা কোন স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে নয়), বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠ হৃদয়ে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর

তরীকা অনুযায়ী, পার্থিব সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে নামাযের প্রতি মনোনিবেশ করবে।

۞ তকবীরে তাহরিমা

অতঃপর তাহরীমার তকবীর 'আল্লাহু আকবার' (অর্থাৎ, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান) বলে হাত দুটি (খোলা অবস্থায়) কানের উপরি ভাগ অথবা কাঁধ বরাবর উত্তোলন করবে।([১]) কানের লতি স্পর্শ করবে না। চাদর পরে থাকলে চাদরের ভিতর থেকে হাত দুটি বের করে 'রফ্য়ে ইদায়ন' করবে।([২]) চাদর দ্বারা মুখ ঢেকে রাখবে না ([৩]) এবং চাদরের দুই প্রান্ত দুই কাঁধের উপড় ঝুলিয়ে রাখবে না; বরং কাঁধে জড়িয়ে রাখবে।([৪])

۞ হস্ত বন্ধন

অতঃপর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর স্থাপন করবে। কখনো বা বাম হাতের চেটোর পিঠের উপর বা কব্জির উপর অথবা প্রকোষ্ঠের (কনুই হতে কব্জি পর্যন্ত হাতের) উপর ডান হাত (ধারণ না করে) রাখবে।([৫]) আর কখনো বা ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতকে ধারণ করবে।([৬])

۞ নামাযে দৃষ্টিপাতের স্থান

অতঃপর সেই বিশাল বিশ্বাধিপতির সামনে একান্ত বিনয়ের সাথে নজর ঝুকিয়ে সিজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখবে।([৭]) আকাশের প্রতি কখনোই দৃষ্টিপাত করবে না ([৮]) এবং আশেপাশে কোন দিকে ও চোখ টেরা ক'রে দেখবে না।([৯]) মনে মনে এই ধারণা করবে যে সে যেন আল্লাহকে দেখছে। তা সম্ভব না হলে ভাববে যে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই দেখছেন।([১০]) তবে তার কোনরূপ আকার মনে কল্পনা করবে না। কারণ তাঁর মত কোন কিছুই নেই।([১১])

([১]) (বুখারী, আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, মিশকাত ৭৯৫, ৮০১নং)
([২]) (মুসলিম, মিশকাত ৭৯৭নং)
([৩]) (সহীহ আবূ দাউদ ৫৯৭, সহীহ ইবনে মাজাহ ৭৮৯নং, মুঅত্তা)
([৪]) (সহীহ আবূ দাউদ ৫৯৭, মিশকাত ৭৬৪নং)
([৫]) (আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ ১/৫৪/২, ইবনে হিব্বান ৪৮৫নং)
([৬]) (নাসাঈ, দারাকুত্বনী, সিফাতু সালাতিন নাবী, আলবানী ৮৮পৃঃ)
([৭]) (বাইহাকী, হাকেম, ইরওয়াউল গালীল ৩৫৪নং)
([৮]) (বুখারী, আবুদাউদ, মুসলিম, মিশকাত ৯৮৩নং)
([৯]) (বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকেম, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫৫১-৫৫২নং)
([১০]) (ত্বাবারানী, মুসনাদে আহমাদ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ৯০পৃঃ)
([১১]) (সূরা শূরা ১১ আয়াত)

۞ ইস্তিফতাহর দুআ

অতঃপর ইস্তিফ্তাহর এই দুআ নিঃশব্দে পাঠ করবে ঃ-

اَللّـهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ،

اَللّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-ইদ বাইনী অ বাইনা খাত্বা-য়্যা-য়্যা কামা বা-আত্তা বাইনাল মাশরিক্বি অল মাগরিব, আল্লা-হুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাত্বা-য়্যা, কামা য়্যুনাক্কাষ ষাওবুল আবয়্যায়ু মিনাদ্ দানাস, আল্লা-হুম্মাগ্সিল খাত্বা-য়্যা-য়্যা বিল মা-য়ি অষষালজি অল্বারাদ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার মাঝে ও আমার গোনাহসমূহের মাঝে এতটা ব্যবধান রাখ যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ব্যবধান রেখেছ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গোনাহসমূহ থেকে পরিষ্কার করে দাও যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহকে পানি, বরফ ও করকি দ্বারা ধৌত করে দাও।([১২])

অথবা পড়বে ঃ-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা অতাবা-রাকাসমুকা অতাআ'-লা জাদ্দুকা অ লা ইলা-হা গায়রুক্।

অর্থঃ- তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার নাম অতি বর্কতময়, তোমার মাহাত্ম্য অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই।([১৩])

অতঃপর বলবে ঃ-

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

উচ্চারণঃ- আঊযু বিল্লা-হিস সামীইল আলীম, মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম, মিন হামযিহী অনাফখিহী অনাফষিহ।

([১২]) (বুঃ ৭৪৪, মুঃ ৫৯৮, আদাঃ ৭৮১, নাঃ, দাঃ, আআঃ ২/৯৮, ইমাঃ ৮০৫, আঃ ২/২৩১, ৪৯৪, ইআশাঃ ২৯১৯৯ নং)
([১৩]) (আদাঃ ৭৭৬, তিঃ, ইমাঃ ৮০৬, ত্বাহাবী ১/১১৭, দারাঃ ১১৩, বাঃ ২/৩৪, হাঃ ১/২৩৫, নাঃ, দাঃ, ইআশাঃ)

অর্থঃ- আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে তার প্ররোচনা ও ফুৎকার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।([১৪])

অতঃপর (নিঃশব্দে) 'বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম' (অর্থাৎ আমি পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আরম্ভ করছি।) বলে অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে, অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করে, প্রাঞ্জলতার সাথে, একটি একটি করে প্রত্যেক আয়াত শেষে থেমে, মিষ্টি সুরে, সূরা ফাতিহা পাঠ করবেঃ ([১৫])

﴿اَلْحَمْدُ للّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلرَّحْمنِ الرَّحِيْم، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْن، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْن، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْم، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْن﴾.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল আ'-লামীন। আররাহমা-নির রাহীম। মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন। ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্তাঈন। ইহ্‌দিনাস্‌ স্বিরা-ত্বাল মুস্তাক্বীম। স্বিরা-ত্বাল্লাযীনা আন্‌আ'মতা আলাইহিম। গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলায্ব য়্যা-ল্লীন।

অর্থঃ- সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও; তাদের পথ -যাদেরকে তুমি পুরস্কার দান করেছ। তাদের পথ নয় -যারা ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী) এবং যারা পথভ্রষ্ট (খ্রিষ্টান)।

সূরার শেষে বলবে, 'আ-মীন' (অর্থাৎ কবুল কর)। সশব্দে পাঠ করলে সশব্দে টেনে 'আ-মীন' বলবে।([১৬]) এই সূরা প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকাআতে পাঠ করবে। এ ছাড়া নামায হবে না।([১৭]) মুক্তাদী হলেও সশব্দ অথবা নিঃশব্দের নামাযেও সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।([১৮]) ইমাম পাঠ করলে তাঁর পিছু-পিছু পাঠ করে শেষে 'অলায্‌য়া-ল্লীন' বললে সশব্দে টেনে 'আ-মীন' বলবে।([১৯])

([১৪]) (আদাঃ ৭৭৫, দারাঃ, তিঃ, হাঃ, ইআশাঃ, ইহিঃ, ইগঃ ৩৪২নং)
([১৫]) (আবু দাউদ, মুসলিম, মালেক, আহমাদ, সিফাতু সালাতিন নাবী ১২৪পৃঃ ও ৯৪ পৃঃ)
([১৬]) (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৮৪৫নং, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১০১পৃঃ)
([১৭]) (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮২২ নং)
([১৮]) (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ৮৫৪নং)
([১৯]) (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮২৫নং)

❁ অন্য সূরা পাঠ

অতঃপর নিঃশব্দে 'বিস্‌ মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম' বলে যে কোন একটি সূরা পাঠ করবে। প্রয়োজন ও সুবিধামত ছোট বা বড় সূরা পাঠ করবে।([২০]) ফজর, মাগরেব ও এশার নামাযে সূরা ফাতিহাসহ অন্য একটি সূরা সশব্দে এবং বাকী যোহর ও আসরের নামাযে নিঃশব্দে পাঠ করবে।

❁ মুক্তাদীর সূরা পাঠ

মুক্তাদী হলে যোহর ও আসরের নামাযে অন্য সূরা পাঠ করবে। ফজর, মাগরেব ও এশার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করে ইমামের কিরাআত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে, অন্য সূরা পাঠ করবে না।([২১])

❁ রুকূর নিয়ম

সূরা পাঠ শেষ হলে একটু থেমে ([২২]) আল্লাহ্‌র তাযীমের উদ্দেশ্যে দুই হাতকে কান অথবা কাঁধ সমান তুলে 'আল্লাহু আকবার' বলে ঝুঁকে রুকূ করবে।([২৩]) উভয় করতল দিয়ে উভয় হাঁটু ধারণ করবে।([২৪]) আঙ্গুলগুলিকে খুলে রাখবে।([২৫]) কনুই বা বাহু দুটিকে পাঁজর ও পেট থেকে দূরে রাখবে।([২৬]) পিঠ এবং মাথাকে সোজা ও সমতল রাখবে।([২৭]) যেন পিঠ থেকে মাথা উঁচু বা নীচু না হয় এবং পিঠের মাঝে পানি রাখলে যেন গড়িয়ে না যায়।([২৮]) দৃষ্টিকে সিজদার স্থানেই নিবদ্ধ রাখবে।([২৯])

❁ রুকূর দুআ

অতঃপর প্রশান্ত হয়ে এই তস্‌বীহসমূহের কোন একটি তিন বা ততোধিক বার পাঠ করবেঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم

উচ্চারণঃ- সুবহা-না রাব্বিয়াল আযীম।

অর্থঃ- আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

([২০]) (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯০নং, মুসনাদে আহমাদ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১০২পৃঃ)
([২১]) (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ, দারাকুত্বনী, মিশকাত ৮৫৪ নং)
([২২]) (আবু দাউদ, হাকেম, সিফাতু সালাতিন নাবী ১২৮পৃঃ)
([২৩]) (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫নং)
([২৪]) (বুখারী, আবু দাউদ, মিশকাত ৭৯২, ৮০২নং)
([২৫]) (হাকেম, সিফাতু সালাতিন নাবী ১২৯পৃঃ)
([২৬]) (তিরমিযী, ইবনে খুযাইমাহ, মিশকাত ৮০১নং)
([২৭]) (মিশকাত ৮০১নং, বাইহাক্বী, বুখারী, ইবনে মাজাহ, ত্বাবারানী, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৩০পৃঃ)
([২৮]) (ত্বাবারানী কাবীর ও সাগীর, ইবনে মাজাহ ৮৭২নং)
([২৯]) (বাইহাক্বী, মিশকাত ৯৯৬নং)

এটি রসূল ﷺ ৩ বার পাঠ করতেন।([৩০])

অবশ্য কোন কোন সময়ে তিনের অধিকবারও পাঠ করতেন। কারণ, কখনো কখনো তাঁর রুকূ ও সিজদাহ কিয়ামের মত দীর্ঘ হত।([৩১])

কোন লম্বা নামাযে একই তসবীহ না বলে নামাযী অন্যান্য তসবীহ মিলিয়ে বলতে পারে।([৩২]) রুকূতে বা সিজদাতে কুরআন মাজীদের কোন আয়াত পাঠ করবে না।([৩৩]) কোন প্রকার তাড়াহুড়া না করে মুরগীর দানা খাওয়ার মত রুকূ-সিজদা করে নামায চুরি করবে না।([৩৪])

۞ কওমাহ

অতঃপর প্রশান্তভাবে 'সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ্' (অর্থাৎ, যে ব্যাক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তা শ্রবণ করেন)। এই দুআ বলে রুকূ থেকে মাথা তুলবে ([৩৫]) এবং কান বা কাঁধ বরাবর হাত তুলবে।([৩৬]) সম্পূর্ণরূপে খাড়া হয়ে দাঁড়ানোর পর বলবে ঃ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

উচ্চারণঃ- রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ। ([৩৭])

অর্থঃ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই নিমিত্তে যাবতীয় প্রশংসা। (অথবা)

৫। رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُّبَارَكاً فِيْهِ.

উচ্চারণঃ- রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দু হামদান কাষীরান ত্বাইয়িবাম মুবা-রাকান ফীহ।

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা, অগণিত পবিত্রতা ও বর্কতময় প্রশংসা।([৩৮])

মুক্তাদী হলে 'সামিআল্লা-হ' না বলে ইমামের বলার পর কেবল 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' ইত্যাদি দুআ পাঠ করবে।([৩৯]) অবশ্য উভয় বলাও

([৩০])(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারাকুত্বনী, ত্বাহাবী, বায্‌যার, ইবনে খুযাইমাহ ৬০৪নং, ত্বাবারানী)

([৩১]) (সিফাতু সালাতিন নাবী ১৩২পৃঃ)

([৩২]) (সিফাতু সালাতিন্নাবী, আলবানী ১৩৪পৃঃ টীকা)

([৩৩]) (মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, মিশকাত ৮৭৩নং)

([৩৪]) (আবু ইয়ালা, বাইহাক্বী, ইবনে খুযাইমাহ, ত্বাবারানী, ইবনে আবী শাইবাহ, হাকেম প্রভৃতি, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৩১পৃঃ)

([৩৫]) (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৩নং)

([৩৬]) (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৪, ৭৯৫, ৮০১নং)

([৩৭]) (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৩, ৭৯৯নং)

([৩৮]) (বুখারী ৭৯৮, মালেক ৪৯৪, আবূ দাউদ ৭৭০নং)

([৩৯]) (মুসলিম, মিশকাত ৮২৬নং)

দোষাবহ নয়।

এই কওমাতে হাত দুটি পুনরায় পূর্বের মত বুকের উপর রাখবে, না ছেড়ে রাখবে, তার কোন স্পষ্ট নির্দেশ শরীয়তে নেই।([৪০])

۞ সিজদাহ

অতঃপর বিনতির সাথে আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যাবে।([৪১]) হাঁটুর পূর্বে হাত দুটিকে মাটিতে রাখবে।([৪২]) (হাঁটুও পূর্বে রাখতে পারে।) ([৪৩]) সাতটি অঙ্গ; নাক সহ কপাল, দুই হাতের চেটো, দুই পায়ের পাতা এবং দুই হাঁটু দ্বারা সিজদারত হবে।([৪৪]) হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলিকে কেবলামুখী করবে।([৪৫]) পায়ের পাতা দুটিকে মিলিতভাবে খাড়া রাখবে।([৪৬]) করতল ও আঙ্গুলগুলিকে বিছিয়ে রাখবে।([৪৭]) আঙ্গুলগুলিকে ফাঁক ফাঁক করে না রেখে স্বাভাবিকভাবে মাটির উপর রাখবে।([৪৮]) হাত দুটিকে কান অথবা কাঁধের সোজা মাটিতে রাখবে।([৪৯]) কনুইকে মাটি ও পাঁজর বা পেট হতে দূরে খাড়া রাখবে।([৫০]) মাটিতে প্রকোষ্ঠ (কনুই হতে কব্জি পর্যন্ত হাত বা হাতের রলা) বিছিয়ে রাখবে না।([৫১]) পেটের সাথে কনুই লাগিয়ে রাখবে না। জড়সড় না হয়ে পিঠকে সোজা রাখবে। নিচের দিকে বাঁকিয়ে বা উপরের দিকে উঠিয়ে কুঁজো করে রাখবে না এবং উরুর স্পর্শ হতে পেটকেও দূরে রাখবে।([৫২])

۞ সিজদার দুআ

স্থিরতার সাথে সিজদাহ অবস্থায় নিম্নের তসবীহ তিন বা ততোধিকবার পাঠ করবেঃ

([৪০]) (সিফাতু সালাতিন্নাবী, আলবানী ১৩৮- ১৩৯পৃঃ টীকা। আল্লামা আলবানীর নিকট রুকু থেকে উঠে পুনরায় বুকে হাত বাঁধা বিদআত। শায়খ ইবনে বায, ইবনে উষাইমীন প্রভৃতির নিকট এটি সুন্নত।)

([৪১])(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯৯নং)

([৪২])(আবু দাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত ৮৯৯নং)

([৪৩]) (আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী। হাদীসটি যয়ীফ; কিন্তু বহু উলামার মতে হাসান ও আমল যোগ্য। তাই সুবিধামত, হাঁটুও আগে রাখতে পারা যায়। দ্রষ্টব্য ঃ সিফাতু সালাতিন্নাবী, ইবনে বায। ফতহুল গফুর, বিসিহহাতি তাক্বদীমির রুকবাতাইনি কাবলাল ইদ্যায়নি ফিস সুজূদ, আল বাহলাল। মাজাল্লাতুল বহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৫ সংখ্যা ৬৬পৃঃ ও ১৮ সংখ্যা ৮৭পৃঃ)

([৪৪]) (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৮৭নং)

([৪৫]) (বাইহাক্বী, ইবনে আবী শাইবাহ ১/৮২/২, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৪১- ১৪২পৃঃ বুখারী, আবু দাঊদ)

([৪৬]) (মুসলিম ৪৮৬নং, আবু দাঊদ ৮৭৯নং, নাসাঈ ১৬৯নং)

([৪৭]) (আবু দাঊদ, হাকেম, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৪১পৃঃ)

([৪৮]) (ইবনে খুযাইমাহ, বাইহাক্বী, হাকেম, ঐ ১৪১পৃঃ)

([৪৯]) (আবু দাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইরওয়াউল গালীল ৩০৯নং)

([৫০])(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৮৯নং ও ৮৯১নং)

([৫১])(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৮৮নং)

([৫২]) (মিশকাত ৮৮৮নং, সিফাতু সালাতিন্নাবী, ইবনে বায ৭পৃঃ)

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلى. (সুবহা-না রাব্বিয়্যাল আ'লা)

অর্থঃ- আমি আমার মহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি।(৫৩)

দীর্ঘ নামাযে উপরোক্ত একাধিক তসবীহ একত্রে মিলিয়ে পড়তে পারে নামাযী।(৫৪)

সিজদাহ অবস্থায় বান্দাহ অধিক অধিক আল্লাহর নিকটবর্তী হয়। তাই এতে অনেক অনেক দুআ (প্রার্থনা) করতে বলা হয়েছে।(৫৫)

অতঃপর 'আল্লা-হু আকবার' বলে ধীরতার সাথে সিজদাহ থেকে মাথা তুলবে। বাঁ পায়ের পাতা বিছিয়ে তার তলদেশের উপর বাঁ পাছা রেখে বসবে।(৫৬) ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে (৫৭) এবং এর আঙ্গুলগুলিকে কেবলামুখী করে নেবে।(৫৮) এমন সোজা হয়ে বসবে যাতে প্রত্যেক অস্থি তার নিজ জোড়ে স্থির হয়ে যায়।(৫৯)

۞ দুই সিজদার মাঝে দুআ

এ সময় হাত দুটিকে উরু ও জানুদ্বয়ের উপরে রাখবে এবং (নিঃশব্দে) এই দুআ পড়বে ঃ

اَللّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ (وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ) وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী অরহামনী (অজবুরনী অরফা'নী) অহদিনী অ আ-ফিনী অরযুক্বনী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, (আমার প্রয়োজন মিটাও, আমাকে উঁচু কর), পথ দেখাও, নিরাপত্তা দাও এবং জীবিকা দান কর।(৬০)

অতঃপর পুনরায় পূর্বের ন্যায় 'আল্লা-হু আকবার' বলে দ্বিতীয় বার সিজদায় যাবে এবং পূর্বোক্ত তসবীহাদি পাঠ করবে। অতঃপর 'আল্লা-হু আকবার' বলে সুস্থিরভাবে সিজদাহ থেকে উঠে পুনরায় পূর্বের মত বসবে, যেন প্রত্যেক হাড় নিজের জায়গায় বসে যায়।(৬১)

(৫৩) (আবূ দাউদ ৮৮৫নং, দারাকুত্বনী, ত্বাহাবী, বাযযার, ত্বাবারানী)
(৫৪) (সিফাতু সালাতিন্নাবী, আলবানী ১৩৪পৃঃ)
(৫৫) (মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, বাইহাক্বী, মিশকাত ৮৯৪নং)
(৫৬) (আবু দাউদ, মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, ইরওয়াউল গালীল ৩১৬নং)
(৫৭) (বুখারী, বাইহাক্বী, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৫১পৃঃ)
(৫৮) (নাসাঈ, ঐ ১৫১পৃঃ)
(৫৯) (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯০-৭৯১, আবু দাউদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত ৮০১নং)
(৬০) (আবু দাউদ ৮৫০, তিরমিযী ২৮৪, ইবনে মাজাহ ৮৯৮, হাকেম, মিশকাত ৯০০নং, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৫৩পৃঃ)
(৬১) (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, দারেমী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৮০১নং)

۞ সিজদা থেকে ওঠা

এক্ষণে কোন দুআ নেই। হালকা বসে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য করতল দ্বারা মাটির উপর ভর দিয়ে, (৬২) খমীর সানার মত মুসাল্লার উপর ভর দিয়ে, (৬৩) (মতান্তরে) জানুর উপর ভর দিয়ে উঠে দন্ডায়মান হবে।(৬৪)

۞ দ্বিতীয় রাকআত

পূর্বের রাকআতের ন্যায় বক্ষঃস্থলে হস্তদ্বয় যথানিয়মে স্থাপন করে 'বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহিম' বলে সূরা ফাতিহা সহ অন্য একটি সূরা পাঠ করবে। তবে এ স্থলে উঠার পর হস্তোত্তলন করবে না এবং দুআ ইস্তেফতাহ্‌ও পড়বে না।(৬৫) বাকী আমল প্রথম রাকআতের মতই করবে। অবশ্য এ রাকআত প্রথম রাকআতের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ছোট হবে।(৬৬)

তাশাহ্‌হুদ

দ্বিতীয় রাকআতের দুই সিজদা করার পর পূর্বের ন্যায় বসে যাবে। অর্থাৎ বাঁ পায়ের পাতার উপর বাঁ পাছা রেখে বসবে। ডান পায়ের পাতা খাড়া রেখে আঙ্গুলগুলিকে কেবলা-মুখী করে নেবে এবং ডান হাত ডান জানু ও বাঁ হাত বাঁ জানুর উপর রাখবে।(৬৭) ডান হাতের আঙ্গুলগুলিকে বন্ধ রেখে কেবল তর্জনী (শাহাদাৎ) আঙ্গুল খুলে রাখবে ও তদ্দ্বারা (তওহীদ বা) কেবলার দিকে ইশারা করবে এবং দৃষ্টি আঙ্গুলের উপর রাখবে।(৬৮) কখনো বা ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল দুটি বন্ধ রেখে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলিকে মিলিয়ে গোলাকার বালার মত বানিয়ে তর্জনী হিলিয়ে (তওহীদের প্রতি) ইশারা করবে।(৬৯) অতঃপর তাশাহ্‌হুদের দুআ পাঠ করবে ঃ-

(৬২) (বুখারী ৮২৪ নং, তামামুল মিন্নাহ ১৯৬পৃঃ)
(৬৩) (আবু ইসহাক হারবী, তামামুল মিন্নাহ ১৯৬পৃঃ)
(৬৪) (আবু দাউদ ৮৩৯ নং, হাদীসটি যয়ীফ, অনেকের নিকট হাসান আমল যোগ্য। দেখুন, সিফাতু সালাতিন্নাবী ইবনে বায ৮-৯পৃঃ, মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ১৫/৬৬, ১৮/৮৭)
(৬৫) (মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৫৫পৃঃ)
(৬৬) (বুখারী, মুসলিম, ঐ ১১২, ১৫৫পৃঃ)
(৬৭) (আবু দাউদ, বাইহাক্বী, মিশকাত ৮০১নং)
(৬৮) (মুসলিম, মিশকাত ৯০৬-৯০৭, আহমাদ, মিশকাত ৯১৭নং, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৫৮পৃঃ)
(৬৯) (মুসলিম, মিশকাত ৯০৮, আবু দাউদ, দারেমী, মিশকাত ৯১১নং)

۞ তাশাহ্হুদের দুআ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণঃ- আত্-তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অস্সস্বালা-ওয়া-তু অত্ত্বাইয়্যিবা-তু, আসসালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহ, আসসালা-মু আলাইনা অ আলা ইবা-দিল্লা-হিস্ব স্বা-লিহীন, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।

অর্থঃ- মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বর্কত বর্ষণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের উপর সালাম বর্ষণ হোক। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষি দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল।([৭০])

প্রকাশ যে, 'আস-সালামু আলান নাবিয়্যে' বলাও সাহাবা কর্তৃক প্রমাণিত আছে।([৭১])

۞ দরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা স্বাল্লাইতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিউ অ আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি

([৭০]) (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯০৯নং)
([৭১]) (মুসনাদে সিরাজ ৯/১/২, ফাওয়ায়েদ ১১/৫৪/১, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৬১-১৬২পৃঃ, মিশকাত তাহকীক আলবানী ১/২৮৬)

ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।

হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ কর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।([৭২])

۞ দুআ মাষূরাহ্

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, অ আউযু বিকা মিন আযা-বিল ক্বাব্‌র, অ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জা-ল, অ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহয়্যা অ ফিতনাতিল মামা-ত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, কানা দাজ্জাল, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।([৭৩])

প্রকাশ থাকে যে, নামাযের শেষ বৈঠকে উক্ত চার প্রকার আযাব ও ফিত্না থেকে পানাহ্ চাওয়া, বহু উলামার নিকট ওয়াজেব।([৭৪]) অবশ্য এর পরে আরও অন্যান্য দুআ মা-সূরাহ্ পড়ে মোনাজাত করা যায়।([৭৫])

এ স্থলে 'রাব্বানা আ-তিনা' ইত্যাদি অন্যান্য সহীহ মুনাজাতের দুআও পড়তে পারা যায়।([৭৬]) আর এটাই হচ্ছে সঠিক মুনাজাতের স্থান।

۞ দুআ মাষূরাহ্র পর

নামায দুই রাকআত বিশিষ্ট হলে আত্-তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দুআ মাসূরাহ আদি পাঠ করে সালাম ফিরবে। তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট হলে

([৭২]) (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯১৯ নং)

([৭৩]) (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১নং)
([৭৪]) (সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৮২পৃঃ দ্রষ্টব্য)
([৭৫]) (মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, নাসাঈ, ইবনুল জারূদ ২৭নং, ইরওয়াউল গালীল ৩৫০নং)
([৭৬]) (নাসাঈ, আহমাদ, ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১৪২, সিলসিলাহ সাহীহাহ ৮৭৮নং, মুসলিম আবু আওয়ানাহ, নাসাঈ, জারূদ ২৭নং, ইরওয়াউল গালীল ৩৫০নং)

কেবল আত্-তাহিয়্যাতু পড়ে তৃতীয় রাকআতের জন্য 'আল্লাহু আকবার' বলে পূর্বের নিয়মে উঠে দন্ডায়মান হবে।

প্রকাশ যে, প্রথম বৈঠকেও দরূদ পড়া যায়।([৭৭])

অতঃপর নামাযী দুই হাতকে কাঁধ বা কান বরাবর তুলে বুকে স্থাপন করে 'বিসমিল্লা- হির রাহমা-নির রাহীম' বলে নিঃশব্দে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং রুকূ ক'রে অন্যান্য আমল শেষ করবে। তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা লাগাবে না। অবশ্য কখনো কখনো অন্য একটি করে সূরা মিলিয়ে পড়তেও পারে।([৭৮]) যেমন প্রথম দুই রাকআতে ফাতিহার পর অন্য সূরা লাগানো জরুরী নয়।

অতঃপর তৃতীয় রাকআত শেষ হলে মাগরেবের নামাযে তাশাহ্হুদ ও দরূদ-দুআ পাঠ করে সালাম ফিরবে। নচেৎ দ্বিতীয় সিজদা করার পর হাল্কা একটু বসে চতুর্থ রাকআতের জন্য যথানিয়মে উঠে দাঁড়াবে এবং পূর্বের মতই হাত বুকে বেঁধে অন্যান্য আমলসহ এই রাকআতও সুসম্পন্ন করবে। শেষ সিজদার পর (তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআতবিশিষ্ট নামাযে) এমনভাবে বসবে যাতে বাম পাছা মাটির উপর থাকে এবং বাম পায়ের পাতাকে ডান পায়ের জঙ্ঘার (রলার) নিচের দিকে বিছিয়ে দেবে।([৭৯]) ডান পায়ের পাতাকে খাড়া। রেখে আঙ্গুলগুলিকে কেবলামুখী করবে। বাম হাটুকে বাম করতলের গ্রাস বানাবে এবং ডান হাতের প্রকোষ্ঠ (রলা)কে ডান জঙ্ঘার (পায়ের রলার) উপর না রেখে উরুর উপর রাখবে।([৮০]) আঙ্গুল ও দৃষ্টিকে যথানিয়মে রেখে ইশারা করা ও হিলাবার সাথে সাথে তাশাহ্হুদ, দরূদ ও দুআ আদি পাঠ করবে এবং সবশেষে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবে,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰه.

'আস্সালা-মু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হ।'

অর্থাৎ, তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক।

অতঃপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপ বলে সালাম ফিরবে।([৮১])

এই সালাম ফিরার সাথে সাথেই নামায শেষ হয়ে যায়। প্রকাশ যে,

([৭৭]) (মুসলিম, আবু আওয়ানাহ ২/৩২৪, নাসাঈ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৬০-১৬৫পৃঃ, তামামুল মিন্নাহ ২২৪পৃঃ)

([৭৮]) (বুখারী, মুসলিম, সিফাতু সালাতিন নাবী ১১৩ ও ১৭৮পৃঃ)

([৭৯]) (বুখারী, মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, আবু দাউদ, বাইহাক্বী, মিশকাত ৮০১নং)

([৮০]) (আবু দাউদ, নাসাঈ, সিফাতু সালাতিন নাবী ১৫৭পৃঃ, মুসলিম আবু আওয়ানাহ, ঐ ১৮১পৃঃ)

([৮১]) (মুসলিম, মিশকাত ৯৪৩নং, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত ৯৫০নং) কখনো-কখনো এর সাথে 'অ বারাকা-তুহ্'ও যোগ করবে। (আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ ১/৮৭/২, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব ২/২১৯, আবু ইয়ালা ৩/১২/৫২, ত্বাবারানী, দারাকুত্বনী, সিফাতু সালাতিন্নাবী ১৮৭পৃঃ)

মহিলারাও পুরুষদের মতই একই পদ্ধতিতে নামায আদায় করবে।([৮২])

নামায বিনষ্টকারী কর্মাবলী

১। ইচ্ছাকৃত নামাযের কোন শর্ত, রুক্ন বা ওয়াজেব ছেড়ে দেওয়া।
২। ওযূ ভেঙ্গে যাওয়া।
৩। ইচ্ছাকৃত কথা বলা অথবা হাসা।
৪। পানাহার করা।
৫। নামায-বহির্ভূত কাজে অত্যাধিক নড়া-চড়া করা।

নামাযে যা করা মাকরূহ

১। আকাশের দিকে দৃষ্টি তোলা অথবা এদিক-ওদিক তাকানো অথবা চক্ষু বন্ধ রাখা।
২। অপ্রয়োজনে নড়া-সরা করা।
৩। পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রাখা।
৪। আকাঙ্ক্ষিত খাবার উপস্থিত রেখে নামায পড়া।
৫। ছবি অথবা মূর্তির সামনে নামায পড়া।

সমাপ্ত

([৮২]) (ইবনে আবী শাইবাহ ১/৭৫/২, ঐ ১৮৯পৃঃ)